তনয়

BANGLADARSHAN.COM

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥তনয়॥

লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকলাম। আমার বদরাগী স্ত্রী, যার নাম মিনতি, মেজাজ ভাল দেখলে যাকে আমি আদর করে মিনু বলে মিন মিন করে ডাকি, সামনের প্যাসেজে হাতে ঘড়ি বেঁধে নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ পরে পায়চারি করছিল। ভুরুর কাছে কপালের ওপর সেই মেজাজ খারাপের ভাঁজ, চোখে ওয়াইন কালারের চশমা। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে বিশাল একটা তারা সন্ধ্যার প্রদীপের মতো ভাসছে।

‘হে হে এসে গেছি ম্যাডাম।’ বউকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি মাঝে-মধ্যেই বোকার মতো হে হে করি। আমার হ্রেষাধ্বনি।

‘ফিফটিন মিনিট্স লেট। বলেছিলুম সাড়ে ছটায় ঢুকবে। এখন পৌনে সাত।’

‘খুউব চেষ্টা করলুম, হে হে খুউব চেষ্টা, অফিস থেকে বেরোলুম, তীরবেগে দৌড়লুম, জাম্প করে সামনে যা পেলুম তাইতেই গোঁত্তাগুঁত্তি করে ঢুকে ঝুলতে ঝুলতে, উঃ কাঁধ থেকে হাতটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।’

‘ছেলে মানুষ করতে হলে একটু কষ্ট করতেই হবে, আমাদের দশমাস, তোমাদের সারা জীবন।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। সেই গানে আছে না, মা হওয়া কি মুখের কথা। চলো, ভেতরে চলো।’

BANGLADARSHAN.COM

‘দেরি আছে, আর একজন কখন ঢোকে দেখি। দেখতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।’

‘অপূর্ব ফেরেনি এখনও খেলার মাঠ থেকে?’

‘অত সহজে?’

অপূর্ব আমার ছেলের নাম। কিশোর দ্রুতগতিতে যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। গলায় বয়সা লেগেছে। বাপের চেহারা পেয়েছে, মায়ের মেজাজ। পড়লে ভাল ফল দেখাতে পারত, মাথায় খেলা ঢুকে বারোটা প্রায় বাজতে বসেছে। সামান্য অবাধ্যতা এসেছে। কথায় বার্তায় বেপরোয়া ভাব। জেদি। নিজের ব্যাপারে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। যেমন আজ। নির্ঘাত মায়ের হাতে চড়-চাপড় খাবে। অন্য দিন হলে এই সময় আমি ধর্মতলায় ফুরফুর করে উড়ে বেড়াতুম। কে সি দাশের চায়ের আড্ডা। কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ ইভনিং শোয়ে ইংরেজি সিনেমা। নটা সাড়ে নটার আগে বাড়ি ফেরা কোষ্ঠীতে লেখেনি। সেই কোষ্ঠীর ফলাফল এখন বংশদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। ছেলে বিগড়োয় বাপের জন্যে। মিনতির স্পষ্ট অভিযোগ—লাইক ফাদার লাইক সান। যেমন দেখবে তেমনি শিখবে। পরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না। নিজেকে দেখতে হয়। আমার কী? লোকে বলবে, অমুকের ছেলেটা বিশ্ববখাটে হয়ে গেল। মার বদনাম নয়, বাপের বদনাম। এখন থেকে সজাগ হলে তোমারই মঙ্গল। নয় তো কাঠ খেলে আঙরা বেরোবে।

ঠিক কথা। ক্যাঁটকেঁটে শোনালেও সারগর্ভ। না, কাঠ খেতে চাই না, বদহজম হবে। আজ থেকে আমার ত্যাগের জীবন, আড্ডা ত্যাগ, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ, অফিস ছুটির পর বাস ট্রাম খালি হবার আশায় আর সময় কাটানো নয়, লাঠালাঠি করে বাড়ি ফিরেই ছেলেকে পড়তে বসানো। বাপের শাসন, মায়ের ভালবাসা আর তদারকি। ভবিষ্যতের ইমারত তৈরি করতে হবে ত্যাগের মশলা দিয়ে। প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে দু ফেরতা সেই কলিটা আওড়ে নিলুম।–সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে। ট্যাং ট্যাং করে সাতটা বাজল। ঘড়িটার কীরকম রসকষহীন কেঠো আওয়াজ। সংসার একটা তিরিক্ষি জায়গা। সব সময় যেন কুচকাওয়াজ চলেছে। দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিত হাসছেন। স্বামী বিবেকানন্দ গাইছেন–পড়িয়ে ভব সংসারে ডুবে মা তনুর তরী–

গেল খোলার শব্দ হল। বাপকা বেটা এলেন। আমার মিনুর গলা শোনা গেল, 'কটা বাজল? বলি কটা বাজল?'

'আমার হাতে ঘড়ি নেই।'

'ঘড়ি না থাক চোখ আছে। তোমাকে বলে দিয়েছি যেই দেখবে হাতের রোমকূপ দেখা যাচ্ছে না তখনই বাড়ি ঢুকবে। এই আমি শেষ বলে দিচ্ছি, একচুল এ দিক ও দিক হলে কাল থেকে আর বাড়ি ঢুকতে দেব না।'

'যাও যাও–বাড়ি ঢুকতে দোব না, তোমার বাড়ি?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় মারার শব্দ। আমার ছেলের তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, 'গায়ে হাত তুলবে না মা বলে দিচ্ছি, ওয়ার্নিং, এরপর মা বলে আর মানব না।' আবার একটা চড়ের শব্দ। নাটক বেশ জমে উঠেছে। প্রথম দৃশ্যেই জমিয়ে দিয়েছে। আমার কী ভূমিকা জানি না। তবে নিয়তির ভূমিকা হলে, 'ওরে তুই মারিসনি আর চড়' বলে তারায় সুর ধরে স্টেজে লাফিয়ে পড়াই উচিত যদিও নিয়তির পোশাক নেই। তোয়ালে পরে বাথরুমে ঢোকার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কমলি যখন ছাড়বে না তখন উলঙ্গ হয়ে থাকলেও ছুটতে হবে। আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেডও চুপ করে থাকতে পারে না। ঢ্যাং ঢ্যাং ঘণ্টা, হোসপাইপের হুস হুস জল। তবে সব আগুন জলে নেভে না, বেড়ে যায়। ফোম ছিটোতে হয়, কম্বল চাপাতে হয়।

'কী হচ্ছে কী অপূর্ব, ছি ছি, এই কি ভদ্রসভ্য ছেলের উপযুক্ত কথা? অ্যাঁ, এই কি তোমার সভ্যতা?'

অপূর্ব অপ্রস্তুত। ভাবতেই পারেনি নটার বাবা সাতটায় হাজির। ভূত দেখছে না তো? থ হয়ে গেছে।

'ভেরি ব্যাড, অফুলি ব্যাড।'

আমার মিনু ফোড়ন কাটল, 'চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরিজি বললেই হবে না, শক্ত মুঠোয় ওই লম্বা লম্বা চুলের ঝুঁটি ধরতে হবে। তোমার মতো মিনমিনে বাবাকে দিয়ে হবে না।ডাকা-হাঁকা বাপ চাই।'

হাঁকতে ডাকতে আমি তেমন পারি না। আমার হল গিয়ে প্লেজেন্ট পার্সোন্যালিটি। ভেতরটা আমার কুসুমের মতো কোমল। এই কথা কটাই কত কষ্ট করে বলতে হয়েছে। ছেলেটার মুখ দেখেই মায়া হচ্ছে। আমার মুখেরই আদল। আমারই রক্ত শরীরে বইছে। মুখটা ঘামে ধুলোয় ক্লান্ত। দুটো রাম চড় ইতিমধ্যেই হজম

BANGLADARSHAN.COM

করেছে। মান অপমান বোঝার বয়স হয়েছে। শাসন তো না মেরেও করা যায়। কে বোঝাবে মিনতিকে। ফিজিসিয়ান হিল দাইসেল্‌ফ। 'তুমি ভেতরে যাও আমি দেখছি।' এখন দুজনকেই তোয়াজ করতে হবে। এর মধ্যেই সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে দু-একজন উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। বিনি পয়সার নাটক কে ছাড়ে। মিনতির স্বভাব হল, হারব বললেই হারে গা খামচে খুমচে মারে গা। যেতে যেতে বললো, 'তুমি যা দেখবে জানাই আছে, গত চোদ্দো বছর ধরে দেখেই তো আসছ।'

'তা হলে তুমিই দেখ।'

'আমি তো ক্লাস সেভেন অব্দি দেখেছি। এরপর আমার বিদ্যেতে তো আর কুলোচ্ছে না।'

'তবে ফোড়ন ঝাড়ছ কেন শুধু শুধু। চুপ করে বসে বসে দেখ।'

'চুপ করে বসে বসে দেখ। দেখে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।'

'মুখ ভেঙাবে না।'

'মুখ ভেঙাবে না। যেমন বাপ তেমনি ছেলে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।'

'যেমন মা তেমনি ছেলে।'

BANGLADARSHAN.COM

'খবরদার।'

'খবরদার।'

হয়তো হাতাহাতিই হয়ে যেত। অপূর্ব ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আঃ কি হচ্ছে মা। চুপ কর না। বাবা এইমাত্র অফিস থেকে খেটেখুটে এল।'

'আমিও চুপ করে বসে নেই। সারাদিন সংসারের ধকল সামলাচ্ছি।'

'আহা কী আমার ধকল রে। এইটুকু তো সংসার। কাজের মধ্যে দুই–খাই আর শুই।'

অপূর্ব আমার হাতটা ধরে বলল, 'আঃ বাবা চুপ কর না, এবার চুপ কর, যাও তুমি বাথরুমে যাও।'

মিনতিকে মুখ ভেঙচে বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। ভাগ্যিস দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে আর এক পক্কড় লেগে যেত। বাথরুমে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলুম। কেন মেজাজ খারাপ হয়, কেন মানুষ এমন করে? কেন মিনতির শাসন মানেই মার? অপূর্বর মতো এমন সুন্দর ছেলে কেন বিগড়ে গেল।

ছেলে কেন বিঁগড়োয়? আদরে। আর কিসে? উদাসীনতায়। যেমন মা, তেমনি বাপ। একেবারে সোনায় সোহাগা। আমি ভাবতুম, সংসার, সে আর এমন কী শক্ত ব্যাপার! একটা চাকরি। মাথা গোঁজার একটু জায়গা, বিবাহ, সাবধানে একটি দুটি সন্তান, তারপর এই হাসি, কান্না, অসুখ, আরোগ্য, পালাপার্বণ, স্ফুর্তি, বেড়ানো,

আড্ডা, সিনেমা, চুলে পাক, চোখে চালশে, গেঁটে বাত, কোমরে ব্যথা, দন্তশূল, বিদায়। ছেলে মানুষ? সে তো অটোমেটিক মানুষ হয়ে উঠবে। তার জন্যে অত ভাবার কী আছে? একটা ভাল স্কুল, একজন ভাল শিক্ষক, ভাল খাওয়া। চড়চড় করে বেড়ে উঠে, হাসতে হাসতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, ব্যারিস্টার, প্রফেসার। ভাগ্যে থাকলে সবই ভাল, না থাকলে সবই গেল। সকালে খেয়ে-দেয়ে দূর্গা বলে বেরিয়ে পড়। সবচেয়ে বড় কাজ উপার্জন। বিকেলে সান্ধ্য মজলিশ। সারাদিনের পর সামান্য রিলিফ। এমন কিছু অন্যায় কাজ নয়। বাড়ি ফিরে ভীষণ শ্রান্ত। পরের দিন বেরোনোর জন্যে বিশ্রাম চাই, একটু সুখ চাই। এক কাপ চা, হালকা একটা বই, শান্ত পরিবেশ। ঘুম ঘুম ভাব। কত স্বপ্ন, কত পরিকল্পনা। তোমরা পড়, পড়ে যাও, আমি তো আছিই, তা ছাড়া গৃহশিক্ষক আছেন, স্কুল আছে। অঙ্ক-ফঙ্ক সবই তো প্রায় ভুলে বসে আছি। সে কি সম্ভব! সারাদিনের পর ছেলে ঠেঙানো। আমি খরচ করতে রাজি আছি।

কেউ বলতে পারবে না, বাপের কৃপণতার জন্যে ছেলেটার বারোটা বেজে গেল। ছেলের মা কী ভেবেছে? বাপ আছে। আমার কাজ রান্না-বান্না, সেলাই, টিফিন, শাসন, আদর, একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে সিনেমা, বেড়ানো, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, মান, অভিমান, কলহ, ভাব। গোলেতালে ঠেকা মেরে মেরে কনসার্ট চালিয়ে যাও। সব ঠিক হ্যায় তো ঠিক হ্যায়, নেহি তো ব্লাড প্রেসার, ধর শালাকে, মার শালাকে। গেল গেল, সব গেল। হই হই রই রই ব্যাপার।

BANGLADARSHAN.COM

অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলেন পড়ানো ব্যাপারটা নির্ভর করে অভ্যাসের ওপর। ন্যাক থাকা চাই। সবই অভ্যাসের ব্যাপার, হাঁটার অভ্যাস, খাওয়ার অভ্যাস, কাজ করার অভ্যাস, অভ্যাস যোগ। এই দুর্যোগে সেই যোগই চালু করা যাক দুর্গা বলে। নিজের ছেলেকে পড়াচ্ছি ভেবে যদি খারাপ লাগে ভাবি অন্যের ছেলেকে পড়াচ্ছি। গৃহশিক্ষক আমি। মাসের শেষে একশো টাকা! কাজ আর টাকা এক করতে পারলে বেশ সহনীয় হয়ে ওঠে।

আমি যে জায়গায় ছেলেকে নিয়ে বসেছি সেখান থেকে আমার শোওয়ার ঘর দেখা যাচ্ছে। মিনতি কেমন মজা করে খাটে শুয়ে বই পড়ছে ঠ্যাং এর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে। যত ম্যাও তুমি সামলাও ম্যান। আমি হলুম সকালের কেয়ার-টেকার, তুমি হলে রাতের। না, হিংসে করে লাভ নেই। সত্যিই তো ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে। একমাত্র বংশধর। এখন কী কায়দায় পড়াব? সাবেক আমলের পণ্ডিতমশায়ী কায়দায়, না আধুনিক কালের বন্ধুভাবে। এই কমরেড, এগিয়ে এসো। দেখি কতদূর কী করেছ!

অপূর্বকে এখন বেশ সৌম্য দেখাচ্ছে। ছেলেটাকে বেশি খোঁচাখুঁচি না করলে বেশ ভদ্র আর সভ্য বলেই মনে হয়।

‘কী পড়াবে?’

‘এসো আগে ইংরেজিটাই দেখি, নাকি?’

‘তা দেখতে পারো তবে কিনা অঙ্কটা বেশ ঝামেলা করছে।’

‘বেশ তা হলে অঙ্ক দিয়েই শুরু করা যাক।’

অঙ্কর একটা সুবিধে আছে। ছবি আঁকার মতো, একজন কষে আর একজন দেখে আর মাঝে মধ্যে হুঁ হুঁ করে যায়। শিক্ষক এক একটা পর্ব শেষ করে বলছেন, বুঝেছ তো! ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে পাশ কাটিয়ে চলেছে।

গোটাকতক অঙ্কের পরই একটাতে মোক্ষম ফেঁসে গেলুম। মাথা আর খেলছে না। বুঝলে বুঝলে বলে দু কদম এগিয়েই গতিরোধ। অপূর্ব প্রথয়টায় হয়তো দেখছিল, তারপর সারাদিনের ক্লান্তি, চোখ বুজে আসছে ঘুমে। মাথাটা মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছে। আমি এতক্ষণ খাড়াই ছিলুম, এখন মনে হল বুদ্ধিটা কাত হলে হয়তো খুলবে। ব্রেনটা সেই সকাল থেকেই খাড়া হয়ে আছে একটু কাত না করলে অঙ্কটাকে ঠিক জুতে আনা যাবে না। নাঃ নিজের ব্রেনই ভাল নয়, তা ছেলের ব্রেন কী করে ভাল হবে।

আর পারা যায় না। সকালে ভাল করে কাগজ দেখা হয় না, কাগজটা পড়ে আছে। একটা থ্রিলারের এমন জায়গায় আটকে আছি, সব সময় মনে হচ্ছে একবার খুলে দেখি পরেরটা কী। অপূর্বও কাত মেরেছে। কতক্ষণ সোজা রাখব। নিজের ঝোঁক না এলে পড়তে বসে খাড়া থাকা শক্ত। আমার নিজের চোখই বুজে আসছে। উঃ সেই কোন ভোরে উঠেছি। বুদ্ধি ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে। সংখ্যা ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে। অঙ্কের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

BANGLADARSHAN.COM

খাতার ওপর মাথা রেখে ভোঁস ভোঁস করে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম কে জানে। মিনতির হাতের ঠেলায় ঘুম ভাঙল। ‘বাঃ বাঃ, বেশ পড়া হচ্ছে। একদিকে বাবা কাত অন্য দিকে ছেলে কাত। কাকে কী বলব।’

অপূর্ব আমার আগেই উঠেছে। চোখ জবাফুলের মতো লাল। দুলে দুলে কী একটা পড়ছে গুনগুন করে ভোমরার মতো। নিজের অপরাধ চাপা দেওয়ার জন্যে বললুম, ‘আগে কিন্তু অপূর্ব ঘুমিয়েছে। আমি অনেকক্ষণ জেগেই ছিলুম। তারপর কাত হয়ে নিজেকে সামান্য একটু আরাম দিতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।’

বুঝেছি, সব বুঝেছি। ছেলে পড়ানো তোমার কম্ম নয়। সারা জীবন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দাও। রোব্বার নটার আগে বিছানা ছাড়বে না। অন্য দিন ছটা থেকে ঠেলাঠেলি করতে করতে সাতটায় যদি দয়া করে ওঠো। খুব হয়েছে, চলো, এখন খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর।’

খুব একটা চাপা পরিবেশে আমাদের খাওয়া শেষ হল। বিষণ্ণ একটা ভবিষ্যতের ছায়া বর্তমানের সমস্ত আনন্দ অন্ধকার করে দিয়েছে। কত লোকের কত ভাল হয়। জীবনবাবুর ছেলে ফার্স্ট হয়। প্রশান্তবাবুর ছেলে পাশ-টাশ করে বিশাল টাকা মাইনের জাহাজের রেডিও অফিসার হয়েছে। অমরেশবাবুর ছেলে বিলেত গেছে। উঃ আমাদের যে কী হবে!

অপূর্ব যখন চলে ফিরে বেড়ায় তখন মনে হয় প্রায় সাবালক হয়ে এসেছে। আর কটা বছর! এরপরই জীবিকার বাজারে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে। যুদ্ধ জয়ের জন্য নিজেকে কতটাই বা প্রস্তুত করেছে। এখন যেভাবে চলছে, সেই ভাবে চললে ভরাডুবি। মিনতির পাশে আর শুতে ইচ্ছে করে না। শুলেই দুর্বলতা। নিজের ওপর তেমন আর ভরসা নেই। আগে মনে করতুম আমি খুব সক্ষম পিতা। আমার রক্তে ঘুরছে প্রতিভার মশলা। এক একটি দিকপাল সৃষ্টি করে ড্যাং ড্যাং করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। দেওয়ালে হাসি হাসি মুখে ছবি হয়ে ঝুলব। বছরে একবার গোড়ের মালা পড়ব। সবাই বলবে মিনতি রত্নগর্ভা।

আলো নেভানো ঘরে বিক্ষুব্ধ মন মরা দম্পতি। ঘড়ির টিক টিক শব্দ। বয়েস বাড়ছে। শক্তি কমে আসছে, স্মৃতি ক্ষীণ, শরীর ভাঙছে। নানা রকম ভয় চারপাশ থেকে চেপে আসছে। সবচেয়ে বড় ভয় আবার একটা নতুন দিন শুরু হয়ে যাবে ঘণ্টা কয়েক পরেই। আবার ঘর্ষণ, আবার স্ফুলিঙ্গ, আবার অসন্তোষ। ব্যর্থ দিনের শেষে চাপা রাত। আবার দিন, আবার রাত। একটু একটু করে পরাজয়, ধীরে ধীরে হঠে আসা।

অন্ধকারে মিনতির গায়ে হাত রাখতে গিয়ে গালে হাত পড়ে গেল। চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে জলের ধারা নেমেছে। মিনতি কাঁদছে। এক সময়, এখনও মনে পড়ে, এই বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কত হেসেছি, খুনসুটি করেছি। সেই সব স্লেটের লেখা ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাত কী ভাবে মুখে দিয়ে গেল!

‘তুমি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে কেন মিনতি?’ কোনও জবাব নেই। ‘কেন কাঁদছ বলবে তো।’

BANGLADARSHAN.COM

‘মন ভাল নেই।’

‘কেঁদে কি সমস্যার সমাধান করা যায়। ছেলে বিগড়েছে, শোধরাবার চেষ্টা করতে হবে। এই বয়েসটাই হল বেগড়াবার বয়েস। এই চার দেওয়ালের বাইরে বিশ্রী একটা জগৎ হাঁ করে আছে। তোমার আমার, সকলের সন্তানকেই গ্রাস করতে আসছে। সঙ্গদোষ বড় দোষ। শুধু কঠোর হলেই চলবে না। স্নেহ দিয়ে সঙ্গ দিয়ে ছেলেকে ফেরাতে হবে।’

মিনতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। বাইরে খুব ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। জানালার ফোকরে সিঁ সিঁ শব্দ হচ্ছে। কত রাত হল তবু ঘুম আসছে না। সব স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ছে। তিনি বলতেন, জীবনে অনেক ভুল করেছি তার মাসুলও দিয়েছি। আমি পরাজিত। তুমি জয়ী হও, তা হলে আমি একটু শান্তিতে যেতে পারব। আমি সে কথা শুনিনি। ভুল করাই বোধহয় মানুষের ধর্ম। আমি তো জয়ী হতে পারিনি, আমিও নানাভাবে পরাজিত। আমার ছেলেকেও আমি একইভাবে বলতে চাই, তুমি জয়ী হও। সেও তো পরাজয়ের পথে চলেছে। ভাগ্য হাসছে! আমরা কাঁদছি।

॥দুই॥

সকালবেলা নীরদবাবু এলেন। শীত যাই যাই করছে তবু পরনে একটি লংকোট। মাথায় গোল বোলার্স হ্যাট। হাতে ছড়ি। সাবেককালের দৃপ্তভঙ্গি। মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন। কে কেমন আছে। সংসার কেমন চলছে। এক কাপ চা খাবেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়বে আমাকে বেরতে হবে। ছড়ি হাতে উঠে দাঁড়াবেন। কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছবেন। 'আমি তা হলে চললুম' বলে গটগট করে বেরিরে যাবেন। হয়ত নিজের জীবনেও অনেক সুখ-দুঃখ আছে, ঘাত-প্রতিঘাত আছে। কিছুই গায়ে মাখেন না। সবই যেন কোটের গায়ে ধুলো। ঝাড়লেই উড়ে যায়। অদ্ভুত একটা ভগবৎ বিশ্বাসের আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন।

টুপিটা খুলতে খুলতে বললেন, 'সব ঠিক আছে তো?'

একমাথা সাদা চুল। কালো করে দিলেই এখনও যুবক। লাঠিটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সোফায় বসলেন।

খবরের কাগজটা গুটিয়ে রেখে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এমনি সব ঠিকই আছে।'

BANGLADARSHAN.COM

'এমনি বললে, কেন? এমনি মানে তো অ্যাপারেন্টলি। তার মানে ভেতরে একটু গোলযোগ?'

'তা বলতে পারেন।'

'শরীর গোলমাল?'

'তার চেয়েও মারাত্মক। মনের দিক থেকে আমরা ভেঙে পড়েছি।' মনের মতন মানুষ পেলে দুঃখের কথা শোনাতে ভাল লাগে। মনটা অসম্ভব হালকা হয়ে যায়।

'মনটাকে সারেন্ডার করে দাও। বলো–তোমার কর্ম তুমি কর মা, দেখবে সাহস পাচ্ছ, লড়াই করার শক্তি পাচ্ছ। অটোমেটিক সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে! তোমার কাজ দাঁড় টেনে চলা, ঘাটে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যাঁর তিনি তো হাল ধরে বসে আছেন। বিশ্বাসকে নামিয়ে আনো। ইজিপসিয়ান মতো বলো, আই অ্যাম টোডে, আই অ্যাম ইয়েস্টারডে, আই অ্যাম টোমরো, অ্যাজ আই পাস থ্রু রেকারেন্ট বার্থস, আই অ্যাম এভার ইয়ং অ্যান্ড ভিগরাস। মনটাকে দুলতে দিলেই ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলবে। স্টেডি রাখো।'

নীরদদা হাসতে লাগলেন দেবতার মতো। মিনতি চা নিয়ে এল। চোখে চশমা, মুখ গম্ভীর। সাত সকালেই চোখে চশমা মানে মাথা ধরব ধরব করছে। নীরদদা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বললেন, 'সকালেই মেঘলা মুখ কেন বউমা?'

‘ছেলেটাকে নিয়ে বড় অশান্তিতে আছি।’

‘কেন কী করেছে? কথা শুনছে না?’

‘কথা তো শুনছেই না, উল্টে কথা শোনাচ্ছে। লেখাপড়া ছেড়েই দিয়েছে। সারাদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে হই হই আড্ডা।’

নীরদদা বললেন, ‘কোথায় সে, ডাকো তাকে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমাদের ছেলে খারাপ হতে পারে না। গাছ দেখে ফল চেনা যায় বউমা।’

আমি বললুম, ‘নীরদদা, ফল দেখেও তো গাছ চেনা যায়। হয়তো গাছটাই ভাল জাতের নয়।’

‘ওহে তুমি চুপ করো। তোমার কেবল নেগেটিভ থটস। কই ডাকো তাকে।’ ডাক শুনে অপূর্ব এল। নীরদদা বললেন, ‘এ দিকে এসো, আমার পাশে কিছুক্ষণ চুপ করে বসো। ছটফট কোরো না।’

বাইরের মানুষের কাছে অপূর্ব ভারী ভদ্র। একই ছেলের দুটো ব্যক্তিত্ব! খুব স্বাভাবিক একজন ভদ্রলোকের মতো নীরদদার পাশে বসে আছে, পায়ের ওপর পা তুলে। নীরদদা অপূর্বর ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, ‘দেখি তোমার ডান হাতটা।’ গভীর মনোযোগ দিয়া হাতের তালুটা দেখলেন। ‘ফাইন রবি রেখা, সোজা নেমে গেছে, তোমরা এই ছেলের জন্য ভাবছ।’

BANGLADARSHAN.COM

মিনতির মুখের চেহারা সামান্য পালটাল। ভাগ্য-টাগ্য খুব বিশ্বাস করে। গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়, পাথর-মাদুলি, ফুল-বেলপাতার অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী। নীরদদা হাতটা সরিয়ে রেখে ছেলের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মুখেই মানুষের পরিচয় লেখা থাকে। কী দেখলেন নীরদদাই জানেন। আমাদের বললেন, ‘বাড়িতে পুরনো ডায়েরি আছে?’

‘ডায়েরি!’

‘হ্যাঁ একটা ডায়েরি চাই। অপূর্বকে তোমরা একটা ডায়েরি দেবে। শোন অপূর্ব, তুমি রোজ ডায়েরি লিখবে। যা যা করবে প্রাণ খুলে লিখে যাবে, কিচ্ছু চেপে যাবে না, ভাল কাজ, খারাপ কাজ, নির্ভয়ে লিখে যাবে। আর রোজ একবার করে আমার কাছে আসবে। তোমাকে আমি উপদেশ দোব না। আজকালকার ছেলেরা বুড়োদের পছন্দ করে না। আমরা দুজনে প্রাণ খুলে গল্প করব। আচ্ছা তুমি এখন যাও।’

অপূর্ব টপাটপ আমাদের প্রণাম করে হাসি মুখে চলে গেল। মুখটা দেখে মনে হল পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটা মজা ভেবে নিয়েছে। আমাদের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, নীরদদার নির্দেশ সবই যেন তামাশা। এই বয়েসটা বড় অদ্ভুত। কিসের নেশা, কিসের ঘোর, কিসের স্বপ্ন!

মিনতি বললে, ‘ওর এই বাইরে বেরোনটা বন্ধ করতে পারলে ছেলেটা ভাল হয়ে যেত। কিন্তু লপেটা বন্ধু জুটে সর্বনাশ করে দিলে।’

নীরদদা উঁহু উঁহু করে উঠলেন, ভুল ধারণা বউমা। ঘরে বেঁধে রাখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তেলেভাজার কড়া দেখেছ, এক কড়া তেলে টপাটপ ফুলুরি পড়ছে, তলিয়ে গিয়েই ভেসে উঠে ভাজা ভাজা হচ্ছে, মুচমুচে ভাজা। বাইরের জগৎটা হল তেলেভাজার কড়া, এক একটি প্রাণ এসে পড়চে, ভাজা ভাজা হচ্ছে। ঠিকমতো ভাজা হলে তবেই না স্বাদ, তবে হ্যাঁ দেখতে হবে বেশি ভাজা হলেই বাতিল। মিশতে দিতে হবে কিন্তু নজর রাখতে হবে বকে না যায়।’

টুপিটা হাতে নিয়ে নীরদদা উঠে দাঁড়ালেন, ‘উৎসর্গ করে দাও, জানবে ভাল সংস্কার নিয়ে এলে কখনও বিপথে যাবে না, যেতে পারবে না। আচ্ছা আমি চলি।’ নীরদদা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে খানিকটা আশা ফেলে রেখে গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥তিন॥

আমাদের সামনের বাড়িতে এক গাইয়ে জ্যোতিষী আসেন। বেশ বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। যোগাযোগটা আমার দিকের নয়, মিনতির। এ বাড়ি ও বাড়ি আসা যাওয়া করতে করতে এই জ্যোতিষী ভদ্রলোকের অসীম অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় মিনতি আবিষ্কার করে ফেলেছে। বাঁকা ভাগ্যকে ইনি সহজেই সোজা করে দিতে পারেন। গ্রহনক্ষত্রদের সমস্ত ষড়যন্ত্র এঁর নখদর্পণে।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি এলাহি কাণ্ড। বাইরের ঘরে প্রভাতবাবু গম্ভীর মুখে বসে আছে। কোলের ওপর থেকে একটা গাছ-কোষ্ঠী গড়িয়ে নেমে গেছে মেঝেতে। কোষ্ঠীটা আমার ছেলের। প্রায় হাত পাঁচেক লম্বা। গত বছর আর এক জ্যোতিষী এই বস্তুটি শ দুয়েক টাকার বিনিময়ে বানিয়েছিলেন। যা কিছু খারাপ বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। কোষ্ঠীর ফলাফল যখন পাল্টাবে না তখন জ্যোতিষী পাল্টে কি আর ভাগ্য ফিরবে? এ সব ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনও মতামত নেই। বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। ভাল বললে আশায় নেমে উঠি, খারাপ বললে দিনকতক চিতিয়ে পড়ি। তারপর সব ভুলে-টুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে হারিয়ে যাই।

বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে মিনতি বসে। তার হাতে আরও দুটো কোষ্ঠী গোটানো। একটা মনে হয় আমার, অন্যটা মিনতির। শুধু ছেলেরটা দেখলেই তো আর হবে না। সন্তানের ভাগ্যের উপর পিতামাতার প্রভাবও কম নয়।

আমাকে ঢুকতে দেখে মিনতি মুখ তুলে তাকাল, 'এই যে, এসে গেছ?'

'হাঁ, এসে গেলুম।'

'প্রভাতবাবুকে সামনের বাড়ি থেকে জোর করে ধরে আনলুম।'

প্রভাতবাবু ছক থেকে মুখ তুলে তাকালেন। নমস্কার বিনিময় হল। প্রভাতবাবু আবার গ্রহ-নক্ষত্রের জগতে তলিয়ে গেলেন। মিনতি বললে, 'তুমিও এসে বসো না।'

'আসছি দাঁড়াও।'

ভেবেছিলুম ভেতরে ঢুকে দেখব অপূর্ব হয়ত মন দিয়ে পড়ছে। নিতান্তই দুরাশা। তিনি যথারীতি শোওয়ার ঘরে কম আলোটা জ্বেলে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছেন। হতাশ করে দেওয়ার মতো দৃশ্য। আমরা সারাদিন বাইরের জগতে হা অন্ন, হা অন্ন করে গোলামি করছি, আর ইনি মনের আনন্দে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। ভাগ্য কোষ্ঠীতে নেই। ভাগ্য তৈরি হচ্ছে চোখের সামনে, ঘুমের জগতে। মিনতি এই সামান্য ব্যাপারটা কেন যে বোঝে না। সন্ধের দিকটায় যেই সে প্রভাতবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ফেলে অমনি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এর নাম মধুর শৈশব। পড়বে কী, সারা বিকেলের মাঠের ক্লান্তি বিছানায় ঢেলে দিয়েছে। সারাটা দিন চাকরি-বাকরি ছেড়ে একে চোখে চোখে না রাখলে তাবিজ-কবজে অশ্বডিম্ব হবে। দুনিয়াটা কী অদ্ভুত অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কেউ কারুর কর্তব্য করবে না। ছাত্র ছাত্রের কর্তব্য করবে না, স্ত্রী স্ত্রীর কর্তব্য করবে না, সামাজিক মানুষ তার সম্পর্কে-উদাসীন। ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। ভাঙনের জয়গান গাই।

'কই, তুমি এলে?' মিনতির গলা ভেসে এল। আর গিয়ে কী হবে। মন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে ওই প্রভাতবাবুকেই হয়তো কড়া কথা শুনিয়ে দোব। তখন মিনতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাবে। কথায় বলে বিপদের দিনে একতা বজায় রাখতে হয়। একটা ঘোর অমঙ্গলের ছায়া চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে নইলে সমূলে বিনষ্টি।

বসার ঘরে আসতেই প্রভাতবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'যা দেখছি–'

'কী দেখছেন?'

'মঙ্গল একেবারে ফিউরিয়াস হয়ে বসে গেছে। কোনও কাজ মাথা ঠাণ্ডা করে করতে দিচ্ছে না।'

'তা হলে কী হবে?'

BANGLADARSHAN.COM

তিনটে কোষ্ঠীই পাশাপাশি খোলা। প্রভাতবাবু একবার এটা টানেন তো ওঠা ছাড়েন। সাংঘাতিক কাণ্ড চলেছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তা ছাড়া আপনার কেতু। ফিফ্‌থ হাউসে গ্যাঁট হয়ে বসে আপনার সাংসারিক শান্তি হরণ করছে। ছেলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে দিচ্ছে না। তারপর এই বউদির কোষ্ঠী, বৃহস্পতি বেজায় বলবান। সংসারে টান থাকবে না, সব মিলিয়ে কেলোর কীর্তি। বিয়ের আগে কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন?'

'যখন বিয়ে হয় তখন কী আর ও সবে বিশ্বাস ছিল মশাই?'

'কেন যে আপনাদের বিশ্বাস আসে না। সামান্য সাবধান হলে মানুষের জীবনটা কত সুখের হতে পারে। আপনারও সংসারে তেমন টান নেই, বউদিরও নেই।'

'টান নেই কী মশাই! সংসার সংসার করে চুল পেকে গেল। চামড়া ইওলো হয়ে গেল।'

'বললে কী হবে। কোষ্ঠী বলছে নেই। কদাচিৎ স্ত্রী-পুত্র চিন্তাসক্ত সদা উদ্বিগ্নমনা। এ সব হল গিয়ে বাউল, বায়ুমণ্ডলের কোষ্ঠী। রাহুর প্যাঁচে পড়ে সংসারে ঢুকে বসে আছে। এই যে আপনার ছেলে জানুয়ারিতে না জন্মে আর একটা মাস পরে যদি জন্মাত, সংসারের চেহারাটাই পালটে যেত। কিন্তু গ্রহ। গ্রহ যাবে কোথায়। জানুয়ারিতেই জন্মাতে হবে। শত্রুর ঘরে মঙ্গলকে নিয়ে, বুধকে স্ট্রং করে এসে হাজির হল।'

প্রভাতবাবুর কথা শুনতে শুনতে মনে হল ছেলে যেন আমার চায়ের ব্লেণ্ড। পঁচিশ ভাগ দার্জিলিং পঁচাত্তর ভাগ সিটিসি। স্ট্রং লিকার ফ্লেভার কিছু কম। প্রভাতবাবু বলে চলেছেন, 'যেমন একগুঁয়ে তেমনি জেদি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে একটি কাজও করানো যাবে না। পড়ব তো পড়ব, না পড়ব তো না পড়ব। মাঝে মাঝেই উট্‌কো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তেরিয়া, মারমুখী। বুধের প্রভাবে বুদ্ধি তেমন পাকবে না। সারা জীবনই ছেলেমানুষ। চপল, চঞ্চল।'

BANGLADARSHAN.COM

'তা হলে কী হবে?' মিনতির গলায় মারাত্মক উদ্বেগ।

'ভগবানই ভরসা।'

'এ যুগে ভগবানের ওপর তেমন ভয়সা করা যায় না।'

'তা হলে...'

'তা হলে কী?'

'একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। সামান্য কিছু খরচ হবে।'

মনে মনে ভাবলুম পথে এস বাবা। এই তো লাইনে পড়ে গেছ। মিনতি প্রশ্ন করল, 'সেটা কী?'

‘একটা কবচ, সুরক্ষা কবচ। ভাল দিন দেখে একটা যজ্ঞ করে গ্রহ শান্তি। যে জিনিসটা বেরোবে সেটাকে রূপোর কবজে ভরে তাবিজ করে পরিয়ে দিন। মঙ্গলের ব্যাড এফক্টটা কেটে যাবে।’

‘খরত কত?’

‘কত আর? সামান্যই, শ আড়াই। একটা ছেলের মঙ্গলের জন্যে আড়াইশো কী আর এমন খরচ। আর তা না হলে স্টোন। স্টোনে আরও বেশি খরচ। তবে হ্যাঁ দেখতে ভাল।’

মিনতি আমার মুখের দিকে তাকাল, ‘তুমি কি বলো?’

‘কী আর বলব? তোমার বিশ্বাস থাকে করাও।’

প্রভাতবাবু একগাল হেসে বললেন, ‘দাদার বুঝি বিশ্বাস নেই? খুব আছে। বিশ্বাস না থাকলে কেউ এত খরচ করে এই সব গাছ-কোষ্ঠী করায়!’

মিনতি এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে একটু প্যাঁচ মেরে বসল। সংসার চালায়, আড়াইশো টাকার বেদনা বোঝে।

‘টাকাটা আমি কিন্তু ইনস্টলমেন্টে দোব।’

‘ই ছি ছি ছি।’ প্রভাতবাবু বসে বসেই ঝিঁকি লাফ মারলেন!’

BANGLADARSHAN.COM

মিনতি থতমত খেয়ে বললে, ‘কেন, কেন?’

‘এ কি টিভি না ফ্রিজ বউদি! গ্রহশান্তির ব্যাপারে কি কিস্তিতে হয়?’

তা ঠিক। এক কোপেই গলা নামাতে হয়। ফেলে রাখলেই বিপদ। মেরে বেরিয়ে যাও। জানা কথাই কাজ হবে না। কাজ না হলেই পার্টি চেপে ধরবে।

মিনতি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, ‘কি গো, বল না।’

‘ইচ্ছে যখন হয়েছে করিয়ে ফেল!’

‘এই তো দাদার মত হয়েছে।’ প্রভাতবাবুর এক মুখ হাসি। এক কাপ চা মেরে আড়াইশো টাকার অর্ডার পকেটে পুরে প্রভাতবাবু সামনের বাড়িতে গান শেখাতে চলে গেলেন। কারুর সর্বনাশ কারুর পোষ মাস। ভাল ব্যবসা। যে ব্যবসায় মূলধন হল মানুষের বিপদ, মানুষের দুর্বলতা।

মিনতি কাঁচুমাচু মুখ করে বললে, ‘দুম করে আড়াইশো টাকার ধাক্কা। সবই ছেলেটার ভবিষ্যতের জন্যে। আমার এখন শাড়ি আর সায়া চাই না। কবচটা আগে হোক, তারপর তোমার সুবিধামতো দিও।’

‘তোমার শাড়ি সায়া, এ দিকে আমার গেঞ্জি, পাজামা, আন্ডার-ওয়্যার সব ছিঁড়ে বসে আছে।’

‘কী করা যাবে, ভবিষ্যতের জন্যে বাপ মাকে তো একটু কষ্ট করতেই হবে।’

‘ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করছ, এ দিকে তোমার ভবিষ্যৎ তো সন্ধে থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কোন বাড়ির ছেলে এই অসময়ে ঘুমোচ্ছে তুমি একবার দেখাও তো। এই তো আসার পথে দেখে এলুম, সব বাড়িতেই পড়ার রোল উঠেছে।’

‘আরে সেই জন্যেই তো কবচ? প্রভাতবাবুকে পাকড়াও করে নিয়ে এলুম। বলা যায় না কবচে হয়তো কাজ হবে। অনেক সময় হয়। হয় না?’

‘কী জানি। তুমিই জানো।’

॥চার॥

দুপুরের দিকে অফিসে একটা টেলিফোন এল। মিনতির উদ্বেগ জড়ানো গলা, ‘একবার আসতে পারবে?’

BANGLADARSHAN.COM

‘কেন, কী হল?’

‘তুমি এসো, তেমন কিছু নয়, তবে এলে ভাল হয়। তাড়াহুড়ো কোরো না, ধীরে ধীরেই এসো, তবে এসো।’

‘কোনও বিপদ?’

‘তেমন কিছু নয়, এলেই জানতে পারবে।’

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে খুব খারাপ লাগল। তিনটে মানুষের সংসার, কত সুখের হতে পারত। এমন বরাত, সব সময় একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। নির্ঘাত অপূর্ব একটা কিছু করে বসে আছে। ছেলেটা আমাদের মারবে। কথায় বলে, পেটের শত্রু বড় শত্রু।

দরজার গোড়ায় মিনতি বসে আছে বিষণ্ণ মুখে। দেখে ভারী কষ্ট হল। বছর দশেক আগে এই বাড়ি, এই বউ কেমন ছিল। ছোট্ট একটি শিশু সারা বাড়িতে হই হই করে বেড়াচ্ছে। আমরা দুজনে হাসছি, খেলছি, মজা করছি। আর এখন! আলকাতরা মাখানো একটা ভবিষ্যৎ তেড়ে আসছে।

‘কী হয়েছে? এখানে বসে?’

‘ভেতরে গিয়ে দেখ।’

ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ নাকে এল। শোওয়ার ঘরে মৃদু নীল আলো, নীল মশারি, বালিশে ব্যান্ডেজ বাঁধা একটা মাথা। মিনতি উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

‘কী করে হল, পড়ে গেছে?’

‘না, মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। পাঁচটা স্টিচ পড়েছে।’

‘সে কি!’

‘হ্যাঁ, ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এল, রক্তে মুখ-চোখ ভেসে যাচ্ছে। ডিসপেনসারিতে কোনও ডাক্তার নেই, শেষে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টিচ, ওষুধ ইনজেকশন।’

‘ঘুমোচ্ছে?’

‘না, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, গা-ও বেশ গরম।’

‘হঠাৎ মারামারি।’

‘জানি না।’

BANGLADARSHAN.COM

মশারির ভেতর থেকে অপূর্বর গলা, ‘বাবা এলে?’

‘হ্যাঁ, তুমি এ কী করেছ?’

‘ভেতরে এস, বলছি।’

মশারির বাইরে একটা টুলে বসলুম। অপূর্বর মুখ লাল। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। চোখের পাশে চোয়ালের ওপর কালশিটে। ঘুসি-টুসি খেয়েছে।

‘তুমি ভেব না, কালই সব ঠিক হয়ে যাবে।’

‘সে তো যাবে, তুমি মারামারি করলে কেন?’

‘ওরা তোমাকে অপমান করেছিল।’

‘আমাকে? কারা? কারা তারা?’

‘ওই মোড়ের রকে বসে আড্ডা মারে দুটো ছেলে। যেতে আসতে আমাকে টিটকিরি মারে। আজ তোমাকে তুলে কথা বলেছিল, আমি সহ্য করিনি।’

‘কী বলেছিল?’

‘বলেছিল তোর বাপটা সখী সখী।’

‘ছেলে দুটো তুমি চেনো মিনতি?’

‘খুব চিনি। দুটোই বিশ্ববখাটে। এর চেয়ে বয়সে বড়। এইটুকু পুঁচকে গেছেন ওদের সঙ্গে মারামারি করতে।’

অপূর্ব দৃপ্ত গলায় বললে, ‘বাবার অপমান আমি সহ্য করব না। আজ মার খেয়েছি, কাল মার দোব।

মিনতি বললে, ‘শুনলে কথা! এটা যে কার মতো হয়েছে, বংশ ছাড়া স্বভাব।’

আমাকে সখী বলছে, শুনে নিজেরই রাগ হচ্ছে। তবে আমি হলে এই ভাবে প্রতিবাদ করতে পারতুম না। শুনেও শুনতুম না, উপেক্ষা করতুম। যুগটা তো সুবিধের নয়। নিরীহ মানুষরা এখন কোটরে বাস করে। ছেলেকেই বোঝাবার চেষ্টা করি, ‘আরে রাস্তার লোফাররা কত কি বলে, সব কথা কি গায়ে মাখলে চলে?’

অপূর্ব লাফিয়ে উঠল, ‘আমাকে বলে বলুক, তোমাকে বলবে কেন? আমাকে তো রোজই বলে সখী সংবাদ, আজ তোমাকে বলছে। ওরা দু-তিনজন ছিল তাই আজ মারতে পেরেছে, এরপর এক একটাকে যখন একলা পাব মেরে বৃন্দাবন দেখিয়ে দোব। আমার অপূর্ব।’

রাত খুবই বিষণ্ণ। নয়া জমানার সঙ্গে মানিয়ে চলা যাচ্ছে না। পুরনো বিশ্বাস জীবনযাত্রার ধরন সবই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খেয়ে হয় খাওয়া। ছেলেটা চোট খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে। স্বাভাবিক হতে সময় নেবে।

BANGLADARSHAN.COM

অনেকক্ষণ আমরা দুজনে বাইরের বারান্দায় বসে রইলুম। এক আকাশ তারা পিটপিট করছে শিশুর চোখের মতো। চারপাশ কেমন পালটে গেছে। এক সময় এ দিকে কত নারকেল গাছ ছিল। এখন একটি মাত্র গাছ, সাথীহারা মৃত্যুর দিন গুনছে। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে চারপাশে। টিভি অ্যান্টেনা অন্ধকারে আকাশ হাতড়ে ছবি খুঁজছে। কত নতুন মুখ এসে গেছে এই এলাকায়। পুরনো মুখ আর চোখেই পড়ে না।

মিনতি এক সময়ে বললে, ‘ছেলেটাকে কোনও বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও না।’

‘অতই সোজা! তুমি তো জানো আজকাল একটা ছেলেকে কোথাও ঢোকানো কত কঠিন। অতি কষ্টে ধরাধরি করে এই স্কুলে ঢুকিয়েছি।’

‘আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম থেকেই বলে আসছি, পরিবেশ ভাল নয়, নিজে দেখতে পারবে না, একটা বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও, তবে মানুষ হবে।’

‘সবই বুঝলুম, প্রথমত খরচ, দ্বিতীয়ত একটা ছেলে, কাছ ছাড়া করে দোব! তাই আর গা করিনি। এখন দেখছি সত্যিই ভুল করেছি।’

‘তুমি কালই আশ্রমের মহারাজকে গিয়ে একটু ধর। হাতে-পায়ে ধরলে তোমার কথা শুনবেন।’

‘খরচ!’

‘সে যা হয় হবে। একবেলা খেয়েও ছেলেটাকে যদি মানুষ করা যায়।’

জোনাকির মতো সামান্য একটু আশার আলো অন্ধকারে ভেসে এল। হয়তো সম্ভব হবে। হয়তো মানুষ হবে। হয়তো ঘুরে যাবে। হয়তো ফিরে আসবে হারানো ছেলে। এমন তো হয় দাঁত ওঠার সময়, কত কষ্ট। উঠে গেলে আবার স্বাভাবিক। এটা হয়তো টিথিং প্রবলেম।

‘ঠিক আছে, কাল থেকে আবার উঠে পড়ে লেগে যাই। চল, এখন শোওয়া যাক। অপূর্বর গা-টা একবার দেখ। জ্বর বাড়ছে, না কমছে।’

BANGLADARSHAN.COM

॥পাঁচ॥

স্বামী-স্ত্রী যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলুম মনে হল আমাদের পুনর্জন্ম হল। দীর্ঘ দিনের জ্বর যেন এক পুরিয়া ওষুধে ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল। মহারাজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। অপূর্ব বোর্ডিংয়ে চলে যাবে। দূরে। তা হোক। ওর পক্ষে দূরই ভাল। আশ্রমের নিজস্ব পরিবেশে ধরাবাঁধার মধ্যে লেখাপড়া করবে। খাওয়া দাওয়ার একটু কষ্ট হবে। মাছ, মাংস, ডিম চলবে না, তবে সকাল সন্ধে দুধ পাবে। প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে কি। তা ছাড়া আমরা তো একেবারে উঁচু ক্লাসে ভর্তি করি না।

রিকশায় ফিরতে ফিরতে মিনতি বেশ খুশি খুশি গলায় বললে, ‘যাক বাবা, একটা হিল্লে হল। দেখলে তো, তুমি বলছিলে হবে না, কিন্তু হল তো। ছেলেটার বরাত ভাল বলতে হবে।’

‘এখনই লাফিও না। অতি অখ্যাত জায়গা, বড় একটা কেউ যেতে চায় না তাই হয়তো হল। ছেলেটাকে আসলে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। আমার খুব খারাপ লাগছে।’

‘ভালই হবে বুঝলে। দল ছাড়া না হলে শোধরাবে না।’

বাড়িতে ফিরে মিনতির হাবভাব দেখে মনে হল ছেলের ওপর হঠাৎ যেন খুব সদয় হয়ে উঠেছে। দিনে দিনে একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। মা আর ছেলে বলে মনে হতো না। মনে হতো দুই শত্রু। কথায় কথায় ঠোকাঠুকি। এক পক্ষের সেই শত ভাবটা কেটে গেছে। এমন যেন–কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়। সব কথাতেই আগে বাবা শেষে বাবা।

খেতে বসে অপূর্ব বলল, 'আমি যাব না। আমাকে তোমরা কিছুতেই পাঠাতে পারবে না। বেশি জোর করলে দুর্গাপুরে আমার বন্ধুর বাড়িতে চলে যাব, জীবনেও আমার সন্ধান পাবে না।'

মা বললে, 'ছিঃ ও কথা বলিসনি। ভাল জায়গা, ভাল বোর্ডিং। তোর মতো আরও কত ছেলে আছে। বিশাল খেলার মাঠ। জীবনে মানুষ হয়ে ফিরে আসবি। তখন তোর কত খাতির, আদর যত্ন, ভাল চাকরি, মোটা মাইনে, গাড়ি বাড়ি!'

'ঘোড়ার ডিম। আমি ও সব কিছু চাই না। পড়তে হয় বাড়িতে পড়ব।'

'বাড়িতে তুমি পড়বে না অপূর্ব। যত বছর যাচ্ছে ততই তুমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ যাচ্ছি, বেশ করছি।'

মিনতি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্যা নতুন আর এক দিকে মোড় নিয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

'কথা শুনলে?'

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'তুমি কিছু বল।'

কী বলব! যে কোনও কথাই শুনবে না তার কথাতেই আমাদের চলতে হবে। সব কিছুই ওর ভাল ভেবে করা। শুনলে শুনবে, না শুনলে না শুনবে। মেরে ধরে কিছু হবে না। মারের যুগ চলে গেছে।'

'ও এত বড় লায়েক, আমাদের ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে।'

'তাই তো হচ্ছে।'

মিনতি ছেলেকে বললে, 'না, তোমাকে যেতেই হবে। দেখি তুমি কেমন না যাও।'

'দেখা যাবে।'

মন চাইছিল না তবু আমাকে বলতে হল, 'এ কী তোমার কথার ধরন অপূর্ব। এভাবে কেউ বড়দের সঙ্গে কথা বলে, বিশেষত মা বাবার সঙ্গে?'

‘তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি বাবা, যার পরামর্শে এ সব হচ্ছে আমি তাকেই বলছি।’

‘তুমি কি ভাবো এটা শুধু তোমার মার ইচ্ছেয় হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ তাই। এর পেছনে শুধু মা।’

‘কিছু আর বলার নেই তোমাকে।’

রাতটা হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল। সন্ধের আলো নিভল। চারপাশ থেকে অদ্ভুত একটা হতাশা, একটা অক্ষমতার ভাব ঘিরে এল। কর্তৃত্বের দেওয়ালে ফাটল ধরে গেছে। আর কী হবে! দার্শনিক উদাসীনতায় সব কিছু সইয়ে নিতে হবে। কে জানত জীবন এত সমস্যাসঙ্কুল।

মিনতির মাথা ধরেছে, বিছানায় চলে গেছে। অপূর্ব তার নিজের ঘরে। মার অবর্তমানে একবার তার সামনা সামনি হলে কেমন হয়। ঘরে আলো জ্বলছে, হয়ত জেগে আছে। আমাদের কথা মতো কোনও দিনই ও দরজা বন্ধ করে শোয় না। ঠেলতেই খুলে গেল। আলো জ্বলছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ন্ত শরীর। চিত হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত কপালে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক। শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। শিথিল মুখের চেহারা। আমার ছেলে! পাশেই পড়ে আছে একটা খেলার ম্যাগাজিন। আমি যদি দেবদূত হতাম, ওর কপালে আমার হাত ছুঁইয়ে বলতুম, তুমি সুন্দর হও, তুমি সুন্দর হও, তুমি শান্ত হও, তুমি মহান হও।

BANGLADARSHAN.COM

কোণের দিকে পড়ার টেবিল। বইপত্র ডাঁই হয়ে আছে। বড় আগোছালো ছেলে। চেয়ারের পিঠে একটা প্যান্ট ঝুলছে। টেবিলের নীচে দুপাটি মোজা। কলমের মুখটা খোলা। সামনে একটা কাগজ পড়ে আছে। ছবি আঁকার চেষ্টা হচ্ছিল। গাছ, বাড়ি, বেড়া। একপাশে পড়ে আছে সেই ডায়েরিটা। নীরদদা ডায়েরি লিখতে বলেছিলেন। কিছু লিখেছে কী?

চেয়ারে বসলুম। প্রথম পাতায় নিজের নাম। দ্বিতীয় পাতায় একটা নজরুলের গান। পরের পাতায় নিজেদের ক্লাবে চাঁদার হিসেব। তার পরের পাতায় সে দিনের মারামারির বিবরণ: আমার বাবাকে যারা অপমান করে তারা আমার দুশমন। আর একদিন কিছু বলুক অ্যায়সা ঝাড় খাবে। বাবার বন্ধু আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন, মঙ্গল ভীষণ স্ট্রং আমি মিলিটারিতে যাব, মেজর হব। বাবাকে তখন আমি প্লেনে করে বেড়াতে নিয়ে যাব।

পরের পাতায় লিখেছে: ওরা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার প্ল্যান করেছে। আমি একটু বদমাইশি করি। ওটা আমার স্বভাব। বাবা-মাকে ভীষণ ভালবাসি। ওরা আমাকে তেমন ভালবাসে না। আমার বাবা বড় ভাল মানুষ, মা-ও ভাল তবে মাথাটা একটু গরম। আমার চেয়েও গরম। আমি দুর্গাপুরে পালাব। সেখানে গিয়ে স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করব। ভাল ফুটবল খেলব। তারপর একদিন বড় খেলোয়াড় হব। তখন কাগজে ছবি বেরবে। বাবার কষ্ট দেখলে আমার ভীষণ দুঃখ হয়।

ডায়েরিটা মুড়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলুম। রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়! অদৃশ্য বাঁধন আমাদের বেঁধে রেখেছে। সত্যিই আমরা ওকে তাড়াতে চাই। তাড়িয়ে সুখে থাকতে চাই, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাই। আমরা ক্রিমিন্যাল। মজা করতে করতে বাবা মা। ত্যাগ নেই, প্রকৃত স্নেহ নেই, শুষ্ক কর্তব্য আছে। নিজেদের বোঝা অন্যের ঘাড়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মজায় থাকতে চাই। আমরা কারুর মন বুঝি না, নিজেদের মন নিয়েই ব্যস্ত। অপদার্থ।

বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সরল, নিষ্পাপ একটি মুখের দিকে। বড় হৃদয়হীন পৃথিবীতে পড়েছ তুমি। এখানে নিজের জোরেই তোমাকে বাঁচতে হবে, লড়াই করে।

॥ছয়॥

BANGLADARSHAN.COM

তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে চোখে। কানে আসছে অপূর্বর গলা, ‘মা, মা, পয়সা দাও, চুল কেটে আসি।’

‘হঠাৎ সাত সকালে সব কাজ ছেড়ে চুল কাটা? এটা আবার কী খেয়াল?’

‘এই এত বড় বড় চুল নিয়ে আশ্রমে যাওয়া যায় নাকি? সকালে সেলুন খালি থাকে, ছোট ছোট করে ছেঁটে আসি।’

‘তুই তা হলে যাবি?’

‘হ্যাঁ যাবই তো।’

‘তা হলে কাল খেতে বসে ওরকম করলি কেন?’

‘তোমাদের রাগাচ্ছিলুম।’

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম। মিনতি হাসি হাসি মুখে ঘরে এসে ঢুকল। সবে চান করেছে। চুল এলোমেলো। মশারির কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, ‘জানো বাবুর মত হয়েছে। আজই পুজো দোব। ওঠো ওঠো উঠে পড়ো।’ মিনতি এমন করে বলল যেন কোনও উৎসবের সকাল।

চা খাবার সময় মিনতি বলল, ‘জানো ছেলেটাকে এই তিনদিন খুব ভাল করে খাওয়াতে হবে। তুমি একটু বেশি করে মাছ এনো।’

চুল কদমছাঁট করে অপূর্ব ফিরে এল। কোলে একটা কুকুরছানা। মিনতি অবাক হয়ে গেল, ‘এটাকে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি?’

‘নিয়ে এলুম মা। একজন দেবে বলেছিল। আমি ও দিকে বড় হব এটা এ দিকে বড় হবে।’ বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল, ‘এটাও ছেলে মা, ওর নাম লেখো টম। বিলিতি কুকুর, নেড়ি ভেবো না।’

কুকুরটা ভাল করে চলতে শেখেনি। লগবগ লগবগ করতে করতে একটা কোণের দিকে চলল।

দরজার সামনে ম্লান মুখে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব বললে, ‘তুই একটু দাঁড়া জগো।’ ছেলেটির নাম জগো।

কে এই জগো?

মিনতি জিজ্ঞেস করল, ‘এ ছেলেটি কে রে?’

‘ও খুব গরিব মা। বিশুদার চায়ের দোকানে কাজ করে।’

‘এখানে কী করবে?’

‘কিছু না। ওকে আমার কয়েকটা জামাপ্যান্ট দিয়ে দোব। আমার তো আর লাগবে না।’

BANGLADARSHAN.COM

‘লাগবে না কেন?’

‘ওখানে তো আর কাপ্তেনি চলবে না। বেলবটম-ফটম পরা চলবে না।’

‘এখানে এসে পরবি। তুই কী চিরকালের জন্যে যাচ্ছিস?’

‘কবে আসব কে জানে। কয়েকটা ও পরুক।’

নিজের জামাকাপড় নিয়ে যে পাগল ছিল সে নিজেই হাতে করে গোটাকতক জামাপ্যান্ট জগোকে দিয়ে দিল। একজোড়া চটিও দান করে দিল। এ যেন সন্ন্যাসীর চালচলন! নতুন একটা বেল্ট কিনেছিল। সেটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, ‘বাবা এই বেল্টটা তুমি নাও।’

‘আমি কী করব রে?’

‘তুমি পরবে। বেশ স্মার্ট দেখাবে।’ এক মুখ লাজুক হাসি, কী করে পরতে হয় জানো তো? ঠিক আছে, তোমাকে আজ পরিয়ে দোব। বেল্টটা সামনের টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে ফিরে এসে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা গেল। মা আর ছেলে মুখোমুখি বসে লুডো খেলছে। ঘন ঘন ডাইস নাড়ার কুটকুট শব্দ। মিনতির কোলে কুকুরটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। অপূর্ব মহা উৎসাহে বললে, 'জানো বাবা, মাকে কেটেকুটে ভুট্টিনাশ করে দিলুম। তুমি একটু বসবে হাত মুখ ধুয়ে।'

মিনতির জায়গাটা আমি নিলুম। তুলতুলে নরম গরম কুকুরছানাটা আমার কোলে চলে এল। দু হাত দূরে আমার মুখোমুখি বসে আছে আমার ছেলে।

'তুমি আজ খেলতে যাওনি?'

'না।'

'কেন?'

'আর কী হবে? আমি তো চলেই যাব। আবার কবে আসব, তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই।'

খেলছি, চাল দিচ্ছি, মনটা কিন্তু ভারী হয়ে আসছে। বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে। মা মা ডাক, তেড়ে ফুঁড়ে ওঠা, সব স্তব্ধ হয়ে খাঁ খাঁ করবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অপূর্ব বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। কত রকমের গল্প। ওর বন্ধুবান্ধবদের কথা, তাদের বাড়ির কথা। একবার অভিনয় করেছিল ক্ষুদিরাম, সেই অভিনয় রজনীর কথা। একদিন আমি ওকে খুব মেরেছিলুম সেই কথা। ছেলেটা হঠাৎ যেন একেবারে পাল্টে গেছে। পাল্টেই যখন গেল তখন কেন দূরে পাঠাচ্ছি? আর তো ফেরা যায় না। সব ব্যবস্থাই পাকা। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

এক সময় মজলিশ ভেঙে গেল। নিস্তব্ধ বাড়িতে ঘড়ির শব্দ প্রখর হয়ে উঠেছে। আলোগুলো জোর জোর হয়ে জ্বলছে।

॥সাত॥

ভোর রাতে আমরা দুজনে স্টেশনে নামলুম। এদিককার হাওয়ায় এখনও শীতের ভাব। 'একটা মাফলার আনলে ভাল হতো অপূর্ব।'

'ও কিচ্ছু হবে না বাবা। তুমি সুটকেশটা আমার হাতে দাও।'

‘না রে। তোর হাতে তো বেডিংটা রয়েছে। ওটা বেজায় ভারী।’

‘তুমি দুটোকেই আমার মাথায় চাপিয়ে দাও না।’

‘ধ্যার পাগল।’

একটা সুবিধে স্টেশনের গায়েই আশ্রম, ছাত্রাবাস, বিদ্যাভবন। ভোরের আলোয় বেশ লাগছে। ট্রেনে সারাটা রাত বড় অস্বস্তিতে কেটেছে। বিদায়ের মুহূর্তটা বড় বিষণ্ণ ছিল। ছেলের মাথায় হাত রেখে মার চোখে জল। মিনতি এমনিতে বেশ কঠোর মহিলা, তবু মা তো। এই চোদ্দটা বছর একদিনের জন্যেও ছেলেকে কাছছাড়া করেনি। হঠাৎ বিচ্ছেদ। চোখের পলক পড়ছে না, শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল। ছেলে মাকে বলছে, ‘তুমি কেঁদো না তো। চিয়ার আপ মাদার। কই দেখ তো আমি কি কাঁদছি? আমি তো বীর।’

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালে ট্রেনটা হারিয়ে গেল। স্টেশনের এপাশ ওপাশ দুপাশই দৃশ্যমান এখন। অপূর্ব বললে, ‘জায়গাটা ভালই। কী বল বাবা?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে রে!’

‘তুমি মাকে গিয়ে বোলো, জায়গাটা বেশ ভাল।’

BANGLADARSHAN.COM

এগোতে এগোতে স্টেশানের চারপাশের ঘিঞ্জি ভাবটা কেটে গেল। ফাঁকা ঢেউ খেলানো মাঠ। বেঁটে বেঁটে গাছ। পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ছবির মতো দৃশ্য। আশ্রমের গেট খোলাই ছিল। মন্দির থেকে সমবেত প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। মন্দ লাগছে না। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। যাক ছেলেটার মনের প্রসার ঘটবে। শহরের ঘুপসি জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বিশালের মুখোমুখি। নিজের অপরাধ বোধ খানিকটা কেটে গেল। না ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

আশ্রমের মহারাজ অফিস ঘরে একটা চৌকির ওপর পা মুড়ে বসে ছিলেন। স্নান হয়ে গেছে। বিশাল গম্ভীর মূর্তি। হাতে জপের মালা ঘুরছে টকটক করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও কথা বলেন না। সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রসম্মত আচরণ, না পৃষ্ঠ কশ্চিৎ ব্রুয়াত। গৃহী মানুষদের প্রতি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের ভাব। সংসার কূপে পড়ে আছে কামিনী কাঞ্চনের দাস।

অপূর্ব চলে গেল ছাত্রাবাসে। আমার স্থান হল গেস্ট হাউস। কতক্ষণই বা থাকব। একটা দিনের মামলা। গেস্ট হাউসে বসে থাকতে থাকতে মনে হল, এক সময় প্রথম পুত্রকে মানত করে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়া হতো, আমি আমার প্রথম পুত্রকে বিশাল একটি প্রতিষ্ঠানে গহ্বরে নিক্ষেপ করে গেলুম। ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। পরিচিত থেকে অপরিচিত। সমাজে চলতে গেলে পিতামাতার পরিচয় দিতে হয়, একদিন অপূর্ব সেইভাবেই আমাদের পরিচয় দেবে। অমুক আমার বাবা তমুক আমার মা। সেই আকর্ষণ আর থাকবে না, সেই স্নেহের টান, সেই আবেগ। যাকগে যা হয় হবে।

সারাদিনে বারকতক দূর থেকে অপূর্বকে দেখলুম। অভয়ারণ্যে ট্যুরিস্টরা যেমন দূর থেকে হরিণের পাল দেখে। একবার দেখলুম কলের কাছে থালা আর গেলাস ধুচ্ছে। আর একবার দেখলুম একটা চেয়ার মাথায় করে একতলা থেকে দোতলায় উঠছে। এখানে মায়ের স্নেহ নেই, বাবার প্রতিরক্ষা নেই। কঠিন শাসনের নিয়মে বাঁধা পরিবেশ। আমরা যখন আরামে নরম বিছানায় শুয়ে থাকব অপূর্ব তখন কাঠের চৌকিতে পাতলা তোশকের ওপর। আমরা যখন বড় বড় মাছের দাগা খাব অপূর্ব তখন বিউলির ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট দিয়ে ভাত চটকাবে। হঠাৎ অসুখ হলে মাথার কাছে মা বসে থাকবে না। কী সুন্দর জীবন শুরু হল। মহারাজ আবার বলে দিলেন, 'বেশি আসবেন না, বেশি চিঠি দেবেন না, কথায় কথায় বাড়ি পাঠাবার অনুরোধ করবেন না। ছেলের মন ছিটকে যাবে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে।'

সন্ধের দিকে অপূর্ব আমার কাছে এল। হাতে এক গেলাস দুধ, কাগজে মোড়া দুটো সন্দেশ।

'বাবা, এইটা তুমি চট করে খেয়ে নাও। আমি জানি দুপুরে তুমি কিছুই খেতে পারনি। রাতেও পারবে না।'

'কেন রে?'

'একেই তুমি কম খাও। তার ওপর এই রকম খাবার তুমি জীবনে খাওনি।'

'এ দুধ কোত্থেকে পেলে?'

BANGLADARSHAN.COM

'আমাকে দিয়েছিল।'

'সন্দেশ?'

'আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল উল্টো দিকের দোকান থেকে তোমার জন্যে কিনে আনলুম। বেশ বড় বড়, খেয়ে দেখ বাবা।'

'তুমি খাও। সারাদিন তোমারও খাওয়া হয়নি। বাড়িতে এতক্ষণে তোমার বার পাঁচেক খাওয়া হয়ে যেত।'

'তোমার জন্যে এনেছি, খেতেই হবে।'

'আচ্ছা আমরা একটি আশ্রমের বাইরে যেতে পারি না।'

'অনুমতি নিতে হবে গো।'

মহারাজ মাঠে পায়চারি করছিলেন। অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে চলে গেলুম। গ্রাম গ্রাম, শহর শহর ভাব। হাটতলা। ভাঙা পাইস হোটেল। বেশ বড় একটা মিষ্টির দোকান পাওয়া গেল। গরম রসগোল্লা কড়ায় ফুটছে। আমার পেটুক ছেলের নজর সেই দিকেই। বেঞ্চিতে বসে গোটাকতক বাপ-বেটায় সাবড়ে দিলুম। মনে হল আমরা সপরিবারে পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে এসেছি।

কিছুতেই ভাবতে পারলুম না অপূর্বকে রেখে একা ফিরে যেতে হবে। যেমন করে সংসার ফেলে মানুষ পরলোকে চলে যায়। ফেরার পথে আমরা দুজনে একটা সাঁকোর ওপর বসলুম। দুপাশে চষা ক্ষেত। আকাশে কয়েক লক্ষ জ্বলজ্বলে তারা। কী একটা পাখি কটর কটর শব্দ করছে। মাটির গন্ধ মাখা হালকা হাওয়া। আমাদের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে। বসে থাকতে থাকতে অপূর্ব বললে, 'মা এখন কী করছে কে জানে। সে দিন আমরা কেমন লুডো খেললুম। মার হাতে একদম ছয় পড়ে না।'

'কেমন লাগছে তোমার জায়গাটা?'

'ভীষণ ফাঁকা, তাই না।' আকাশের আলোয় ছেলেটার চোখ দুটো চিকচিকে করছে। জল নয় তো?

আশ্রমে ফিরে এলুম। অপূর্ব বললে, 'তুমি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পোড়ো, পাঁচটায় বাস, তোমাকে ডেকে দোব।'

অন্ধকারে অপূর্ব হারিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

॥আট॥

বাসেই ফিরব ঠিক করেছি। আশ্রমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পাঁচটার সময় বাস আসবে। অপূর্বর মুখচোখ দেখে মনে হল রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

'বাবা তোমরা মাঝে মাঝে আসবে তো?'

'বাঃ, আসব না? প্রায়ই আসব।'

'চিঠি দেবে?'

'নিশ্চয় দোব। তোমার কাছেও পোস্টকার্ড আছে, নিয়মিত চিঠি দিও।'

'ওই যে বাস আসছে। বাবা, মাকে বোলো কুকুরটাকে সময় মতো খেতে দিতে।'

'হ্যাঁ গো, তোমার কুকুর যত্নেই থাকবে।'

বাসে উঠে জানালার ধারে বসলুম। অপূর্ব জানালার কাছে সরে এসেছে। আমার হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। হাতে হাত ঠেকাল। বাস ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

‘সাবধানে থেকো।’

বাসের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ছুটছে। বাসের গতি বাড়ছে, অপূর্বর গতি বাড়ছে। কী করতে চাইছে ছেলেটা? পড়ে যাবে যে। কতক্ষণ ছুটবে এই ভাবে! হাত নেড়ে নিষেধ করলুম তাও শুনছে না।

‘কন্ডাকটার, বাসটা একটু থামাও তো ভাই।’

উঠে পাদানিতে নেমে দাঁড়ালাম। অপূর্ব একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ছুটতে ছুটতে কাছে এল।

‘তুমি কিছু বলবে?’

‘না তো।’

‘তবে ছুটছ কেন?’

‘আমি তো একজন স্টোর্টসম্যান, তোমাকে দেখিয়ে দিলুম আমি কী রকম ছুটতে পারি।’

BANGLADARSHAN.COM

দু চোখে জল টল টল করছে। ঘণ্টা বাজিয়ে বাস ছেড়ে দিল। অপূর্ব স্তব্ধ হয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চিৎকার করে বললুম, ‘তুমি এবার সাবধানে ফিরে যাও।’ দুজনের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। আমিও চোখে ঝাপসা দেখছি। হঠাৎ বাস একটা বাঁক নিল। পাদানি থেকে উঠে এসে আমার আসনে বসে পড়লুম।

বাঁদিকে মাঠ ফুঁড়ে সূর্য উঠছে।

॥সমাপ্ত॥